গরু বেচে সাঈদকে কলেজে ভর্তি করি

মোঃ মকবুল হোসেন*

আমার ছোট দুই ছেলের মধ্যে আবু হোসেন আর আবু সাঈদ পিঠাপিঠি। এরা একসাথে বড় হয়েছে। যখন তারা মাদ্রাসায় পড়ে, মুসলমানি তখনও হয়নি। স্কুলে দ্বিতীয় এবং তৃতীয় শ্রেণি পড়ার পরে জাফরপাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় এসে ক্লাস ফোর এ ভর্তি হয়। সেখান থেকে ফাইভ এ বৃত্তিপ্রাপ্ত হয়। অগ্রহায়ণ মাসে সে বৃত্তিটা পায় ট্যালেন্টপুলে।

বৃত্তির ঘটনাটা ছেলের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এই সময় নতুন একটা ছেলে খালাসপীর থেকে এসে ভর্তি হয় ওর স্কুলে। ছেলেটা খুব ভালো ছাত্র ছিল। তার বাব-মা দুজনই শিক্ষক, তাদের ছেলে ভালো জামা-জুতা পরে স্কুলে আসে। আমি সাঈকে তেমন কিছু দিতে পারিনি। খুব সাধারণভাবে আমার ছেলে স্কুলে গেছে।

বার্ষিক পরীক্ষার রেজাল্ট হলো, সাঈদ প্রথম হয়েছে, ছেলেটা দ্বিতীয়। আমার ছেলে বৃত্তিটা পেল, ঐ ছেলেটা পেল না। সাঈদ তার বাড়িতে যেত, ছেলেটাও আমাদের বাড়িতে আসত। তারপর পড়ল খালাসপীর দ্বিমূখী উচ্চ বিদ্যালয়ে। যেখান থেকেই ম্যাট্রিক পাশ করেছে। ভালো রেজাল্ট (গোল্ডেন জিপিএ ৫) নিয়ে পাশ করেছে।

পাশ করার পর ছেলে আমার রংপুরে গিয়ে কলেজে পড়তে চাইল। তাকে রংপুর শহরে রেখে পড়াশোনার মতো অবস্থা আমার ছিল না। তারপরও মত দিলাম। কারণ, ছেলের আগ্রহ খুব। আমারও বিশ্বাস ছিল, ও পারবে। কেননা, সাঈদ ছোটকাল থেকেই টিউশনি করত। আমার মনে হয়েছিল, একবার শুরু করতে পারলে ও পারবে।

এরপর সে রংপুর সরকারি কলেজ এ ইন্টারে ভর্তির সুযোগ পায়। আমি কী করি? ছেলের জন্য ওই সময় একটা গরু বিক্রি করে সেখান থেকে ত্রিশ হাজার টাকা ওকে দেই। তারপর আর তেমন কিছু দেওয়া লাগেনি। বাড়ি থেকে চাল-ডাল, তরি-তরকারি নিয়ে যেত, ও টিউশনি করাত। এভাবে কলেজটা শেষ করে।

করোনার সময় এক বছর ছেলে আমার গ্রামে ছিল। তারপর বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি পরীক্ষা দিতে ঢাকায় গেছে। সেখান থেকে যাবে গোপালগঞ্জে, ভর্তির ভাইবা দিতো। ওর টাকা দরকার। একদিন রাতে ফোন করেছে আমার কাছে। আমি তখনও একটা গরু বেচে ছিলাম। কত বেচে ছিলাম এখন মনে নাই।

সাঈদ ফোনে বলল, আব্বা গরু বেচেছেন? বলি, হ, বেচছি। ছেলে তখন বলে আমাকে এখনই ৬ হাজার টাকা পাঠিয়ে দেন। আমি বলি, রাতেই দেওয়া লাগবে, সকালে দেই, ছেলে আমার বলে, না, রাতোতেই দ্যান। আমি তখন একজনকে দিয়ে মোবাইলে টাকা পাঠাই। সেই টাকায় সে গোপালগঞ্জ যায়।

ছেলে আমার গোপালগঞ্জ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে চান্স পায়। সেখানে তার সিরিয়াল হয়েছিল ১৬। কিন্তু এতে আমাদের ভাবনা বেড়ে যায়। দূরের রাস্তা, আমরা অভাবী মানুষ, দূরে হলে তো পারব না। এগুলো চিন্তা।

---

* শহিদ আবু সাঈদ এর বাবা

ঐ সময়ে খবর আসে সাঈদ রংপুরেই বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরেজি বিভাগে সুযোগ পেয়েছে। এটা আমাদের জন্য ভালো হলো। তারপর সে রংপুরে ভর্তি হয়। ভর্তির সময়টা কার ব্যবস্থা করা যাচ্ছিল না। তখন আমার সামান্য একটু জমি ছিল। সেটা বন্ধক রেখে সাঈদের ভর্তির ব্যবস্থা করি।

ভর্তির পরে আজও খরচ দিতে পারিনি। ছেলে আমার টিউশনি করেই চলত। এমনকি টিউশনির টাকা বাঁচিয়ে অল্প-সামান্য টাকা বাসায় মাঝে দিত। ছোট বোন সুমিকে হাতখরচ দিত। ওর বোনের বিয়েতে কিছু দিয়েছিল। বাড়িতে আসলে গরুর ভুসি কিনে দিত। গরুর চিকিৎসা করতে টাকা দিয়েছিল। এভাবে সে টিউশনি টাকা দিয়ে সংসারে সহযোগীতা করেছে।

গত কোরবানির ঈদে ছেলে আমার শেষবারের মতো বাড়ি এসেছিল। ঈদের পরদিন সে যায় খালাসপীরের দিকে, মোনাইল গ্রামে এক বন্ধুর বিয়েতে। সেখানে আরও এক বন্ধুর বিয়ে। এই দুইটা বিয়ে খেয়ে বাড়ি আসে।

তখন বেলা তিনটার দিকে হবে। ব্যাগট্যাগ ঘাড়ে নিয়ে আমাকে বলে, আব্বা, মুই যাওছো। ঐ যে গেছে, সেই শেষ কথা। তারপর আর কথা হয়নি। ভাই-বোনদের সাথে কথা হয়েছিল। ওদেরকেই বলত সবকিছু।

ছেলেকে কখনও মারধর করিনি, পড়ার জন্য কখনও বলতে হত না। সাঈদ নিজ আগ্রহেই পড়ত। স্কুল থেকে এসে মাঠে কাজ করত। কৃষিকাজ করার সময় সাঈদ ছিল একজন 'তুখোড় কৃষক'। সবার চেয়ে বেশি কাজ করত।

ছেলেটা আমার অত্যন্ত শান্তশিষ্ট স্বভাবের ছিল। কখনো জিদ করতোনা। কোনকিছুর জন্য বায়না ধরত না। কেননা সে বুঝত যে, দিতে পারব না।

আমাদের খুব অভাব ছিল। খুব কষ্টের দিন গেছে আমাদের। তারপরও ছেলেমেয়েদের কষ্ট দিইনি। কখনও ভাতের কষ্ট পায়নি আমার সন্তানেরা।

ছুটিতে বাড়িতে আসলেও সাঈদ বসে থাকত না। গ্রামে সামাজিক কাজকর্ম নিয়ে থাকত। স্থানীয় সংগঠনগুলোর সাথে সে ঈদের সময়ে দরিদ্র মানুষদের লাচ্চা-চিনি ইত্যাদি দিত। শীতের সময় কম্বল বিতরণ করেছে। খেলাধুলার দিকে নজর ছিল না। ও কখনও আড্ডা দিয়ে বেড়ায়নি।